



সচেতন বার্তা

২য় বর্ষ □ ৬ষ্ঠ সংখ্যা □ জুন ২০১৭

এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন

- সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সৈনিক নজরুল ছিলেন সাম্যবাদী
ড. গাজী তৌহিদুল আলম চৌধুরী
- বাংলা সংগীতে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী অবদান
রতন মজুমদার
- প্রসঙ্গ: মিউজিক থেরাপি
ড. আলেয়া পারভীন

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সৈনিক নজরুল ছিলেন সাম্যবাদী

ড. গাজী তৌহিদুল আলম চৌধুরী*



নজরুল ইসলাম পশ্চিম বাঙলার বর্ধমানের এক গ্রামে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই পরিবার বিচ্যুত এই দরিদ্র মানুষটি জীবনযাপন করেছেন যাযাবরের মত, কথা বলে গান গেয়ে, বক্তৃতা দিয়ে অনবরত লিখে ভেসে বেড়িয়েছেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। তিনি জীবনযাপন করেছেন অদমিত ঝঞ্ঝার মতন অথবা বলা যায় বজ্র, বিদ্যুৎ আর ঝঞ্ঝার মাস-বাঙলাদেশের বৈশাখের মতন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্য গগণে রবিরশ্মি যখন রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহে দীপ্তমান এমনি এক শুভক্ষণে আমাদের জাতীয় কবি লেটো পালাগানের কবি, শ্যামা সঙ্গীতের কবি, গজল গানের কবি, বিদ্রোহী কবি, মানবতাবাদী কবি, প্রেমের কবি, সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ধুমকেতুর মতো আগমন। সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে কাজী নজরুলের সরব পদচারণা ছিল না। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল ছিলেন। বাংলা শব্দ সম্ভার সমৃদ্ধকরণে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ তিনি অবলীলায় ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে বাংলা গানে নজরুলের অবদান অপরিসীম। নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করে বাংলা গানকে অন্য একটি মাত্রায় নিয়ে গেছেন তিনি। একাধারে তিনি গীতিকার, সুরকার এবং সংগীতশিল্পী। তাৎক্ষণিক গান বাঁধতে পারতেন, সুর দিতে পারতেন এবং গাইতে পারতেন। এই উপমহাদেশে একটি কুচক্রীমহল যখন সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়ে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে

সদা প্রস্তুত তেমনি এক সন্ধিক্ষণে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সহ-অবস্থান নিশ্চিত করতে তিনি লেখনী ধারণ করেন।

একই বৃন্তে দু'টি ফুল হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমনি হিন্দু তার প্রাণ

১৯১৭ সালে নজরুল যখন দশম শ্রেণির ছাত্র তখন দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে যাওয়ার। যুদ্ধ চলছিল পুরোদমে, শহরে শহরে খোলা হয়েছিল নিয়োগকেন্দ্র। দুই বন্ধু পালিয়ে যান কলকাতায়। খেলোয়াড়, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নজরুল ইসলাম ৪১ নং বাঙালি পল্টনে সুযোগ পেয়ে গেলেন কিন্তু শৈলজানন্দ সুযোগ পেলেন না। নজরুল সেপাই হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন, কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার, স্টোর-এর পদে উন্নীত হন।

নজরুলের সাহিত্যের অন্যতম ব্যাখ্যাতা আতাউর রহমান তাঁর 'নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা' প্রবন্ধে বলেছেন, নির্যাতিত মানুষের বেদনাকে কাব্যায়িত করার মূলে নজরুলের মনে বৈপ্লবিক ইচ্ছা সক্রিয় ছিল। নিঃশ্ব, নির্বিক্ত মানুষকে তিনি বিপ্লবী চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি কান্তিহীনভাবে এই সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। নজরুলের কল্পিত সাম্যরাজ্যে মানুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। তাদের মাঝে নেই আর্থিক, ধর্মীয় ও বর্ণের বিভেদ। এখানে দেখা গেছে নজরুলের কল্পিত সাম্যবাদী পৃথিবী কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চেতনা থেকে দূরে নয়।

নজরুলের সাম্যবাদ সাহিত্য সৃষ্টির অলঙ্কার ছিল না, ছিল না রাজনৈতিক শ্লোগান। কবিতা, গল্প, গানের মাধ্যমে সমাজে সাম্য ও উদারতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আতাউর রহমান অন্যত্র বলেছেন, নজরুলের সাম্যবাদের প্রেরণা ইতিহাস বোধ থেকে উদ্ভূত কি-না এ প্রশ্ন এখানে তিনি উত্থাপন করতে চান না কিন্তু নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার আন্তরিক উপলব্ধি নেই, এমন উক্তি করা কবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের সামিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আতাউর রহমান বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্যের আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই প্রথম উদ্যোক্তা। নজরুলের স্বপ্ন ছিল ..

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উর্ধ্বে উঠে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে মহীয়ান হয়ে সেই সমাজ নতুন এক মানব সভ্যতার বিজয় পতাকা ওড়াবে-

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি,
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোন মিলনের বাঁশি।
একজনে দিলে ব্যথা-
সমান হইয়া বাজে যে বেদনা সকলের বুকে
হেথা।
মহামানবের মহাবেদনার আজি মহা উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান। নিচে কাঁপিতেছে
শয়তান।
(কুলি মজুর, নজরুল রচনাবলী : ২৪৬)

জাতীয় চেতনা উন্মেষের কালে যেমন সংগীতের বিশেষ ভূমিকা থাকে, শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা বিকাশের সময়ও সংগীতের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই নজরুল লিখলেন-

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙবো চল।
(শ্রমিকের গান, নজরুল রচনাবলী : ২৮১)

শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে ধীবর ও অন্যান্য অবহেলিত মানুষের ভীতি দূর হয়ে যায়। তাঁরাও সংগঠিত হবার প্রয়াস পায়। নিখিল বঙ্গ ধীবর সম্মেলনের জন্য নজরুল গান লিখলেন-

নিচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে।
(ধীবরদের গান, নজরুল রচনাবলী : ২৮৪)

অবিভক্ত বাংলায় নজরুল প্রথমে কংগ্রেসের মধ্যে কৃষক শ্রমিক দল গঠন এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিক-কৃষক প্রজা পার্টি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শ্রমিক-কৃষক পার্টির যে গঠনতন্ত্র কর্মসূচি প্রকাশিত হয়েছিল- তাতে প্রকাশক হিসেবে নজরুল ইসলামের নাম ছিল। শ্রমিক কৃষক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। এ সময় বাউরিয়া চটকলে খিদিরপুরে জাহাজীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে নজরুল তাদের গান শোনাতেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন।

ইউনিয়নগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে নজরুলের এই উদাত্ত সহযোগিতা অনস্বীকার্য। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূচনাকাল পর্যন্ত নজরুলের চেতনায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্বে পৃথিবীতে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, নজরুল সেই আকাজ্জকে বাংলাদেশে তাঁর গল্প-কবিতা-গান এবং উপন্যাসে মূর্ত করে তুলেছিলেন। তাঁর কাব্যে মুসলিম জাগরণের চেয়ে হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রয়াস ঘটেছিল বেশী। মনুষ্য মহিমা তাঁর কাব্যে বারবার বংকৃত হয়েছে। সাহিত্যে ও জীবনে বিদ্রোহ বিপ্লব সংগ্রামে নজরুল ছিলেন আপোষহীন শিল্পী। নজরুল কবি মানসে তাঁর সাহিত্য চিন্তার প্রত্যফলনের মূলে আছে তাঁর নিজস্ব সামাজিক অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সমাজ পরিবেশ সচেতনতা। স্বাভাবিক মানবতাবোধ ও ন্যায়জ্ঞান নজরুলের সাম্যবাদী প্রেরণার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল, রাশিয়া ও ভারতবর্ষেও এই মনোভাবের প্রসার হচ্ছিল। বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের বাণী এমন কি সাম্যবাদ, সমাজবাদও ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রো-এশিয়ায় নির্যাতিত মানুষকে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছিল। তাঁরা আশায় বুক বেঁধেছিল। নতুন উদ্দীপনায় মুক্তির আকাজ্জায় সাহসী ও উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। যন্ত্রশক্তি ও প্রযুক্তির প্রসার সনাতন বিশ্বাস সংস্কারের নীতি নিয়মের মূল্যবোধে আঘাত করেছিল এবং ক্রমে সনাতন মূল্যবোধ শিথিল হয়ে পড়েছিল। তখন তিনি গাইলেন-

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান
গাহি সাম্যের গান।
(সাম্যবাদী, নজরুল রচনাবলী : ২৩৩)

শোষিত মানুষের বেদনাকে কাব্যায়িত করার মূলে নজরুলের মনে রূপবিক ইচ্ছা সক্রিয় ছিল। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে তিনি সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। কান্তিহীনভাবে তিনি তাঁর এই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সর্বহারা কাব্যের প্রথম গানেই কবি বিশ্বের নির্যাতিত মানুষকে মায়ার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে প্রলয় পারাবার পার হওয়ার জন্য 'নায়ে পাল তুলে' দিতে বলেছেন-

মাঝিরে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল।
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
(সর্বহারা, নজরুল রচনাবলী : ২৭৯-২৮০)

‘নব্যযুগ’, ‘লাঙল’, ‘ধুমকেতু’ ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশবাদী ভারতবর্ষের ধনতান্ত্রিক রক্ষাব্যুহে আঘাত হেনেছিল। নজরুল দারিদ্রের ভেতর থেকে সাম্যের বাণী নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন। শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নজরুল। ‘প্রলয়োল্লাস’, ‘সর্বহারা’, ‘সাম্যবাদী’ কবিতাগুলো তারই নিদর্শন। নজরুলের সাহিত্য ও চিন্তা দু’টি রাজনৈতিক ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এক. সাম্যবাদ, দুই. ব্রিটিশ শাসনকে সমূলে বিনাশ করা। তাঁর রচনা বাজেয়াপ্ত হয়েছে ব্রিটিশবিরোধীতার জন্যেই শুধু নয়, কমিউনিস্ট আদর্শে রাজনৈতিক মনোভাব এর অন্যতম কারণ। কার্ল মার্কসের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হোক কিংবা সহজাত সাম্যবাদী চেতনা দ্বারাই হোক কাজী নজরুল তাঁর লেখায় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আজীবন ছিলেন দমিতের পক্ষে।

নজরুল নিজেকে বলেছেন বিদ্রোহী। ঘোষণা করেছেন থামাবেন না। তাঁর যুদ্ধ যতদিন না তিনি দেখছেন, শেষ হয়েছে পৃথিবীর সকল শোষণ। তিনি বন্ধু ছিলেন সম্মানবাদীদের, সেই যুবক-যুবতীদের যারা বিশ্বাস করত সশস্ত্র আন্দোলনে। রাজনৈতিক সভার উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছেন তিনি, বক্তৃতা দিয়েছেন বিরাট বিরাট সম্মেলনে, মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন বাঙলার যে কোনো জায়গায়। তিনি একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন যার প্রচারে ও প্রাণে ছিল বিদ্রোহ। ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এক বছর জেল দেয়। তিনি যে সব বিপ্লবাত্মক বই লেখেন সারা দেশে তা আগুন ধরিয়ে দেয়। এইসব বই-এর কোন কোনটা কর্তৃপক্ষ দ্রুত বাজেয়াপ্ত করে দেয়। কিন্তু সে সব বই-এর সবগুলোই প্রচার ঘটেছিল ব্যাপক; এমনকি কোন কোনটার গোপন সংস্করণও প্রকাশ হয়েছিল। ক্রুদ্ধ হয়ে সরকার আবার তাঁকে ছয় মাসের জেল দেয়। কিন্তু গান্ধী এবং আরউইনের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে এবার আর জেল খাটতে হয়নি। দেশের জন্যে এ ধরনের একজন

কবির প্রয়োজন ছিল জরুরি। তাঁর আবির্ভাব ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে। এই যুদ্ধে তিনি সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ ভারতকে সংযুক্ত করে বহির্বিশ্বের সাথে। ভারতের মনে জাগিয়ে তোলে স্বাধীনতার আশা। অবশ্য যুদ্ধ শেষ হলেও ভারতে কোন সন্তোষজনক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। যুবসমাজ ভাবে, ব্রিটিশদের মনে ভারত ছাড়ার জন্য ভয় ধরিয়ে দেয়াই একমাত্র বিকল্প পথ।

যুদ্ধের পরে যখন কংগ্রেসের নতুন উপদলগুলো চাপ সৃষ্টি করল, নেতৃত্বকে তখন বাধ্য হয়ে কিছু সরাসরি কাজের কর্মসূচি নিতে হয়েছিল। গান্ধী ব্রিটিশের সাথে শান্তিপূর্ণ অসহযোগিতা এবং ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দেন। তাঁর ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। ব্রিটিশ পণ্য দহন, খেতাব বর্জন, ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন ঘটতে থাকে সারা দেশে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে একটি অস্ত্রবিহীন জনসভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে গুলি করে পুলিশ, দেশের তিক্ত মানসিকতায় তা ইন্ধন হিসেবে কাজ করে। বিক্ষুব্ধ হতে থাকে দেশ। যুব সম্প্রদায় হয়ে ওঠে সম্মানবাদী; যেমন নিজেদের তেমনি ব্রিটিশ অফিসারদেরও রক্ত ঝরাতে থাকল তারা। যেখানেই সম্ভব গুলী করল অফিসারদের, চিটাগাং-এ করল বিখ্যাত সশস্ত্র ঘেরাও। গালি-গালাজ, বন্দি প্রতিবাদ, মিছিল, খবরের কাগজ পোড়ানো হয়ে দাঁড়াল নিত্যদিনের কাজ।

এই নতুন চেতনার একজন প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন নজরুল ইসলাম, হয়ে উঠলেন এর মূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তাঁর চেতনাসত্তা ছিল বিদ্রোহের। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধী মনোভাব তাঁর অস্থি মজ্জা জুড়ে।

তিনি তাঁর সময়ের মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। একজন বীরের মধ্যে যে সাহসকে মানুষ কামনা করে সেই সাহস আর মধ্যবিত্তের ঘৃণা ও বিদ্বেষকে কণ্ঠ দিয়েছিলেন তিনি। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘বর্তমানের আমি কবি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী।’ কিন্তু নজরুল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন কৃষক শ্রমিকের আন্দোলনে। তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মী কমরেড মুজাফফর আহমদ ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। বন্ধুর মত নজরুলও বিশ্বাস করতেন সর্বহারার রাজনীতিতে।

১৯২১ সনে তিনি তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত কবিতা ‘বিদ্রোহী’ প্রকাশ করেন। এ শতাব্দীর বিশের দশকের প্রথমে নতুন সাহসী মনোভাব এবং স্টাইল নিয়ে এই কবিতার মাধ্যমে তিনি যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন একটি মাত্র কবিতার দ্বারা সেরকম ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে থাকে। নজরুলের বিদ্রোহ ছিল বুর্জোয়া বিরোধী। মধ্যবিত্ত মানসিকতা ক্বামেলাকে ঘৃণা করে, মনে করে এসব নিয়মতান্ত্রিক সমস্যা, নজরুল তা করেন নি। আক্রমণকে রুখতে হয় প্রতি আক্রমণ দিয়ে। অত্যাচারীরা চিরকালই আক্রমণাত্মক, অত্যাচারিতের মুক্তির জন্যও তাই এটাই প্রয়োজন। ‘চির উন্নত মম শির’ বলে কাজী নজরুল ইসলাম সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। কুসংস্কার, ধর্মাত্মতা ও কূপমুণ্ডকতার বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। গেয়েছেন মানবতার গান।

১৯২২ সালে ধুমকেতু ঘোষণা করেছিল যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য এই পত্রিকা। যদিও সারা ভারতের জনগণ স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সেই সময়ে এমন কি রাজনৈতিক নেতারাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন নি। তারা তখন বলেছেন, “ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন” কিংবা ‘স্বরাজ’-এর কথা। উর্দু কবি, রাজনীতিবিদ হসরত মোহানি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের এলাহাবাদ সেশনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নেন। নজরুলের কাছে মুক্তি ছিল রাজনৈতিক মুক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাঁর কাছে মুক্তি অর্থ রাজনীতি ও শাসনের চিরাচরিত ধারার নিষ্পেষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নানা রকম সামাজিক বন্ধন, বিধিনিষেধ এবং গোঁড়ামি থেকে মুক্তি। আমাদের অবশ্যই বিদ্রোহে জাগরিত হওয়া দরকার। ‘আমি আপনাকে ছাড়া করি না কাহারে কুর্গিশ। এর ভেতরে আত্মকেন্দ্রিকতার চাইতে রয়েছে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান।

আসুন, আমরা জাতীয় কবি নজরুল ইসলামকে জানি এবং তাঁর আদর্শ ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করি।

সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ), সরকারি মুজিবর রহমান মহিলা কলেজ।

বাংলা সংগীতে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী অবদান

রতন মজুমদার*



বাংলা ভাষায় রচিত যে গান, সে গানই বাঙালির একান্ত নিজস্ব গান। বাংলা গানের ভিতর দিয়ে বাঙালির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। বাঙালির সৃজনশীল প্রয়াসের ব্যাপকতম অবলম্বন হচ্ছে গান। আর বাংলাদেশের বিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্রনাথের অবদান বহুমাত্রিক। তাঁর হাতেই বাংলা গান যথার্থ আধুনিক হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর বিবেচনায় ঐতিহাসিক অর্থে নিধুবাবু ছিলেন বাংলাগানের ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রবক্তা। কিন্তু দেবদেবী থেকে সরে গিয়ে মানব-মানবীর ভালবাসার গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই যুগের উন্মোচন করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেম, প্রকৃতি, দেশ এবং আনুষ্ঠানিক গানে মানবকেন্দ্রিক বিষয়কে প্রগাঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলায়-সম্পূর্ণগান রচনা পরিপক্বতা পায়। তিনি গানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরচিত সুর প্রয়োগের একটি ব্যপক এবং দৃঢ় ভিত্তিও গড়ে তুলেন। দিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত প্রমুখ রবীন্দ্রসাময়িক রচনার এই ধারাটি প্রতিষ্ঠা পায়। ক্রমে এই রচনারীতিটিই বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধুনিক সংগীত ঘরানার প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

রীতিমুক্ততা : আধুনিকতার একটি মাত্রা হচ্ছে রীতিমুক্ততা। রবীন্দ্রনাথ যে একটি সাংগীতিক রীতিমুক্ত রীতি গড়ে তুলেছেন তাতে ধ্রুপদীয় উপাদান, লোকসংগীতের উপাদান, পদাবলী কীর্তন ও তার উত্তরকালীন বাংলাগানের যাবতীয় সদগুণ বজায় আছে প্রকৃতপক্ষে এই রীতিযুক্ত শুচিবায়ুমুক্ত, সর্বাধিক সাংগীতিক উপাদানের মিশ্রণে গঠিত সাংগীতিকতাই হচ্ছে বাংলাগানের ধারার আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ-এর প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে তুলেন।

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি : রবীন্দ্রনাথ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। আর তা হলো-একটি নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে গান রচনা করা। বাংলা গানের জন্য তিনিই প্রথম নান্দনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। পদাবলী কীর্তনকে ঘিরে নান্দনিক-পটভূমি গড়ে উঠলেও হিন্দুস্থানি সংগীতের অভিযানে তা সুস্থিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সরল ও একাত্মসুরের রেখার সাহায্যে বাণীর অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুকে তীব্র করে তোলাই বাংলা গানের

উপজীব্য। সাংগীতিক নান্দনিকতার যে ধারাটি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করেন তা তার সমসাময়িক ও পরবর্তী রচয়িতাদের প্রভাবিত করে।

গানের বিষয়বৈচিত্র্য : রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভাবলে বহুবিষয়ে গান লিখেছেন। সকল ক্ষেত্রেই তাঁর রচনা সমান সার্থক ও রসোত্তীর্ণ। মানুষের মনে এমন কোন ভাবনা নেই যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বাণীবদ্ধ করেননি। প্রকৃতিতে এমন কোন রং বা দর্শন নেই যার সার্থক প্রতিফলন তাঁর গানে ঘটেনি। সংগীতের বিষয় ভিন্নতার বিচারে তিনি গানকে মূলত ৬ টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা-পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ, আনুষ্ঠানিক ও বিচিত্র। পূজা পর্যায়ের গানে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগের বাইরে এক সহজ বিশ্বাস ও প্রেমের পথে তিনি ইশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকচেতনার বিশিষ্ট দিকগুলিই পূজা পর্যায়ের গানের ভাববস্তু। গীতবিতানের পূজা অংশের ভিন্ন বিষয়গুলো হচ্ছে গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা, সংকল্প, দুঃখ, সুন্দর, আত্মবোধন, আনন্দ, পথ শেষ, পরিণয়, বাউল ইত্যাদি।

মানবীয় প্রেমের নানা লীলাবৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর প্রেম পর্যায়ের গান। প্রেমের এমন কোন স্তর বা নারী পুরুষের এমন কোন প্রেমভাবনা নেই যা তিনি এই গানগুলিতে ধরে রাখেননি। পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, প্রেমবৈচিত্র্য, মাথুর, নিবেদন ইত্যাদি বিষয়গুলির ভিতর দিয়ে প্রেমের নানা স্তর ও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে।

আজ যে আমরা ঋতু উৎসবে মিলিত হই এসবের সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ষাকাল, শেষ বর্ষ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, নববর্ষ প্রভৃতি রবীন্দ্রকল্পিত। তার প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সংখ্যা প্রায় ৩০০।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে সব উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গান লিখেছেন সে গুলিই স্বদেশ পর্যায়ের গান। তাঁর স্বদেশি গানগুলি মূলত বিশ্বচেতনার পরিচয় বহন করে। স্বদেশ পর্যায়ের একটি জনপ্রিয় গান-

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা

রবীন্দ্রনাথ বিবাহ, জন্মতিথি, গৃহপ্রতিষ্ঠা, শোকসভা, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গাইবার উপযোগী অনেক গান রচনা করেছেন। এগুলি আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের। যেমন:

ওই মহামানব আসে

এবং

হে নূতন দেখা দিক আরবার

এছাড়া মানবজীবনের আরো নানা অনুভূতি, উল্লাস, আর্তি নিয়ে রচিত গানগুলি বিচিত্র পর্যায়ের। এতে আছে খেলার গান, চলার গান, চায়ের গান, হাসির গান, চাষীর গান প্রভৃতি। বিচিত্র পর্যায়ের জনপ্রিয় একটি গান-

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন, এই বাটে

সুতরাং বলা যায়, বিষয়ের বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রসংগীতের ভান্ডারটি পূর্ণ তথা বাংলা গানের ভান্ডার বিশাল।

রামপ্রসাদী সুরেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। যেমন :

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে

বাংলার নিজস্ব সুর ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নানা গানের সুরকে আশ্রয় করে অনেক গান রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সংকীর্ণতামুক্ত সাংগীতিক মন নানা প্রদেশের নানা সুর সংগ্রহ করে এবং তাঁর শিল্পসুন্দর প্রয়োগে গান হয়ে উঠেছে বিচিত্র রসের অমৃত উৎস।

রবীন্দ্রনাথের ভাঙ্গা গান : রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাঙ্গ সংগীতের সুর ভেঙ্গে অজস্র গান রচনা করেছেন। বাংলার বাইরের নানা আঞ্চলিক গানের সুরে এমনকি পাশ্চাত্য অনেক গানের সুরে তিনি গান রচনা করেছেন। নিম্নে কিছু ভাঙ্গাগান ও মূলগান উল্লেখ করা হল :

ভাঙ্গা গান

মূল গান

বড়ো অশা করে এসেছি গো - সখিবাবা (কানাড়ী)

বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী-

মীনাষ মে মৃদশ (মাত্রাজী)

আমার সোনার বাংলা-

আমি কোথায় পাব তারে

এবার তোর মরা গাঙ্গে-

মন মাঝি সামাল সামাল

কালী কালী এলরে আজ-

Nancy lee (আইরিস)

পুরানো সেই দিনের কথা-

Auld lany Sync (স্কচ)

সুর ও তালে সৃজনী প্রতিভা : উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতে ও নানা আঞ্চলিক গানে প্রচলিত তালকে তিনি তাঁর গানে

ব্যবহার করেন। আবার ছন্দের নতুনত্বের জন্য তিনি নতুন কিছু তালও সৃষ্টি করেন। সুর সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উল্লাসের গানগুলিতে। বিলেতি সুরের আদর্শে অথবা দেশি রাগরাগিনীতে তিনি বহুসংখ্যক উদ্ভিদের গান রচনা করেন। ভারতীয় নানা রাগরাগিনী, নানা আঞ্চলিক সুর, ইউরোপীয় মেলোডির নানা চলন- তাঁর সুরের প্রধান উপজীব্য। এগুলোর স্বার্থক সমন্বয়ের সৃষ্টি আমাদের বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যবিচিত্রা : রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য (বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা), নৃত্যনাট্য (চিত্রাঙ্গদা, চন্ডালিকা, শ্যামা), ঋতুনাট্য, ভানুসিংহের পদাবলী ইত্যাদি বাংলাগানের মানকে করেছে উন্নত।

বাংলা গানের আদর্শ : রবীন্দ্রনাথ সংগীত জীবনের শুরুতেই বাংলাগানের মূল প্রকৃতিকে অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, “কালোয়াতি বাংলাগানের আদর্শ নয়, বাংলা গানের আদর্শ হচ্ছে সুরের সাহায্যে কাব্যকে অন্তরে ধ্বনিত করা।” এই আদর্শকে সংগীতে রূপ দেয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্তানি সংগীতের ভেতর থেকেও ভিন্ন একটি সংগীত রীতি গড়ে তুললেন।

উপসংহার : বাংলা গানের উৎকর্ষ সাধন বা বাংলার স্বকীয় সংগীত চঙ গঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অর্জন বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ বাউলে আগ্রহ দেখালেন, কীর্তনে দেখালেন। খেয়ালের সঙ্গে, ধ্রুপদের সঙ্গে বাউল মিশিয়ে এক-জাতিখোয়ান জাতের অসামান্য সংগীত চঙ করলেন। বাংলা নাগরিক গান গ্রামের গানের সঙ্গে মিশে নবরূপে দেখা দিল। যা গাইবা মাত্র বোঝা যায়, এ গান বাংলাগানে গভীরতম ছাপ রেখেছে। কাজেই বলা যায়, বাংলাগানে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী অবদান অনস্বীকার্য।

আসুন, রবীন্দ্রনাথের গান শুনি, গানের বাণী উপলব্ধি করি।

শিক্ষার্থী, এম.মিউজ (উচ্চাঙ্গ বিভাগ)
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মিউজিক থেরাপি

ড. আলেয়া পারভীন*



মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে সংগীত এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে বিবাহ, উৎসব, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বা যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মানুষ মিউজিক বা সংগীত পরিবেশন করে থাকে। এমনকি মৃতব্যক্তির সৎকার এবং আধুনিক সময়ে চিকিৎসায় পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে মিউজিক। তাই মিউজিককে বলা হয় মানুষের আত্মার শক্তিশালী পদার্থ। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে সুদীর্ঘকাল থেকেই মিউজিক চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর মধ্যে জাপান ও কম্বোডিয়া অন্যতম। এদুটি দেশ ছাড়াও বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, তাইওয়ান, কানাডাসহ আরো বেশ কয়েকটি দেশে মিউজিক বা সংগীতের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং দিন দিন মিউজিক থেরাপি বা সংগীতের মাধ্যমে চিকিৎসা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মিউজিক থেরাপি বা সংগীত চিকিৎসা কি : সাধারণ অর্থে মিউজিক থেরাপি বলতে মিউজিক বা সংগীতের মাধ্যমে চিকিৎসা করাকে বুঝায়। একজন সংগীত চিকিৎসক সাধারণত রোগীর মানসিক এবং সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী সংগীতের মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা করে থাকেন। এ জন্য গান গাওয়া, গান শোনানো, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, গান রচনা ইত্যাদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। সংগীত চিকিৎসার মাধ্যমে একজন রোগীকে তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করার সাথে সাথে তাঁদের মোটর স্কিল উন্নত করা হয় (বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে) যা তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি নতুন পথ দেখায়। বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের অনুভূতির কথাগুলি বলতে পারেন না। আরো সহজ ভাষায় বললে বলা যায়, একজন মানসিক বা শারীরিক আঘাত পাওয়া ব্যক্তি খারাপ অভিজ্ঞতার কারণে তাঁর অনুভূতির কথাগুলি কখনো কখনো কোনোভাবেই ব্যক্ত করতে পারেন না। সংগীত চিকিৎসা এই সমস্যার প্রাচীর ভেঙ্গে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব বা চেপে রাখা অনুভূতিগুলি বের করে আনে। কেননা অন্য রকমের বিনোদনের মত হালকা সংগীত শোনা বা সম্পাদন করার ফলে মস্তিষ্কে এর একটি প্রভাব পড়ে যা আমাদের জ্ঞান, অনুভূতি বা শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

মিউজিক থেরাপি কিভাবে কাজ করে : বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে জানা যায়, মানবশরীরের এমন কিছু রোগ আছে যা তার মৃত্যুর কারণ। সেই রোগগুলোও সেরে উঠতে পারে সংগীত থেরাপির সাহায্যে। সাধারণত মানবশরীরে সংগীত শারীরিক ও মানসিক -এ দুভাবে কাজ করে। সংগীত মস্তিষ্কে তরঙ্গ পাঠায়। স্নায়ুর উপর কাজ করে। সে কারণেই গানের ছন্দে নেচে ওঠে শরীর। ‘রক’ গান শুনলে খুব স্বাভাবিকভাবেই হাত বা পায়ে তাল দিতে থাকে যে কেউ। উত্তেজনা তৈরি হয়। ফলে নাচতে ইচ্ছে করে। আবার একইভাবে মনকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয় সংগীত। আর সে কারণেই মা শিশুকে গান গাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারেন।

মিউজিক থেরাপিস্টের কাজ : একজন মিউজিক থেরাপিস্ট বা সংগীত চিকিৎসক রোগীকে তাঁর পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী ভাল লাগানোর জন্য গান শেখান। চিকিৎসক তাঁর রোগীর সঙ্গে একটি সুস্থ ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেন যাতে এই চিকিৎসা রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে। সঙ্গীত চিকিৎসার মাধ্যমে একজন মিউজিক থেরাপিস্ট রোগীকে নানা রকম পরিস্থিতি সামলাতে এবং নিজের জীবনকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করে।

কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : বলা হয়ে থাকে মিউজিকেই ম্যাজিক। গান শুনলে রোগ উধাও। বিশেষ করে ক্রনিক অসুখের ক্ষেত্রে সংগীত থেরাপি পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই দেখা যাক কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে মিউজিক বেশী প্রযোজ্য।

রক্তচাপ এবং হৃদযন্ত্রজনিত ব্যাধি নিরাময়ে : গ্রেট বৃটেনের কার্ডিওভাসকুলার সোসাইটির মতে, একটি নির্দিষ্ট সংগীত টানা দশ সেকেন্ড শুনলে রক্তচাপ অনেক কমে আসে এবং হৃদকম্পন কমাতেও সাহায্য করে। বেশকিছু ক্লাসিক্যাল কম্পোজিশন রয়েছে যা মানব শরীরের ভাষার সঙ্গে মিলে যায়। হৃদযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ওই কম্পোজিশনগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্যা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় জানা যায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি হাইপারটেনশন কমাতেও সংগীত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সিওপিডি নিরাময়ে : সিওপিডি (ক্রনিক অবসট্রাকটিভ

পালমোনারি ডিজিস)-এর অন্যতম চিকিৎসা ব্যবস্থা হল সংগীত। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য জানা যায়। এ গবেষণায় সিওপিডি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যায় জর্জরিত রোগীদের সংগীত থেরাপি দেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে তাদের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা যায়। আমেরিকার The Louis Armstrong Center for Music & Medicine at Mount Sinai Beth Israel - এর একদল গবেষকের গবেষণায় এ তথ্য দেখা যায়। সিওপিডি-তে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মারা যান। এ রোগে আক্রান্তরা ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ৬৮ জন রোগীর ওপর পরীক্ষা পরিচালনা করেন। এসময় রোগীদের সংগীত, দৃশ্যমান সংগীত এবং ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে মিউজিক শোনানো হয়। একে বিশেষজ্ঞরা মিউজিক সাইকোথেরাপি বলে অভিহিত করেছেন। লুইস আর্মস্ট্রং সেন্টারের পরিচালক Joanne Loewy বলেন, ক্রনিক ডিজিসের ক্ষেত্রে বহুকাল ধরে গতানুগতিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্তু এর সঙ্গে সংগীত যোগ করায় দারুণ ফলাফল আসছে। তাই ক্রনিক রেসপিরেটরি ডিজিসের চিকিৎসায় মিউজিক থেরাপি প্রচলিত চিকিৎসাকে দারুণভাবে কার্যকর করছে।

ক্যান্সার নিরাময়ে : যুক্তরাষ্ট্রের ড্রেক্সেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জোক ব্রাড নেতৃত্বাধীন একটি গবেষক দল সম্প্রতি ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মিউজিক বা সংগীতের প্রভাব নিয়ে গবেষণা চালিয়ে তাদের মধ্যে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে ইতিবাচক ফল পেয়েছেন। ৩৭৩১ জন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা জানিয়েছেন যে, সংগীত রোগীদের অবস্থার উন্নতিতে বিশেষভাবে কাজ করে। গবেষক দলের প্রধান ব্রাড বলেন মিউজিক থেরাপি ও মিউজিক মেডিসিন দুটোই ক্যান্সার আরোগ্যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তবে আমরা এখনও জানি না ঠিক কোন ফলের জন্য কোন থেরাপি প্রয়োজন।

মানসিক বা স্নায়ুরোগ নিরাময়ে : অটিজম, এডিএইচটি, ডাউনসিনড্রোম, আলঝেইমার, পারকিনসনস অ্যামেনেসিয়া, ডিমেনসিয়া, সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি নানা রকম রোগের ক্ষেত্রে সঙ্গীত চিকিৎসা যথেষ্ট কার্যকর। স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের দাবি শরীরের জন্মগত রোগ সারাতে মিউজিক থেরাপির কোনও বিকল্প নেই। কানাডার বিখ্যাত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায় সংগীত মানুষের মস্তিষ্কে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ..

সক্ষম এবং পরিবর্তনের পক্ষে আনুষঙ্গিক রসায়নও উৎপাদন করে। মানবশরীরে ডোপামিন নামে একটি হরমোন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সংগীত। এই হরমোনের কারণেই মানুষের ভেতর আনন্দের সঞ্চার হয়।

আলঝেইমার রোগে আক্রান্তরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে অতটা পারদর্শী হয় না। কিন্তু সংগীত তাদের যোগাযোগে পারদর্শী করে তোলে। আমেরিকার আলঝেইমার ফাউন্ডেশনের স্টাডি অনুযায়ী সংগীত মানুষের মেজাজ, রাগ কমাতে এবং ইতিবাচক দৃষ্টি তৈরিতে অনেক কার্যকর।

অটিজম আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় মিউজিক থেরাপির জুড়ি নেই। কেননা অটিজম আক্রান্তদের মস্তিষ্কের একেজো কোষগুলিকে স্বাভাবিক করে তোলে মিউজিক। যারা নিয়মিত সংগীত চর্চা করেন তাদের মধ্যে হিউম্যান গ্রোথ হরমোনও বৃদ্ধি পায়।

স্ট্রোকের কারণে লোপ পাওয়া বাকশক্তি ফিরে পেতে কিংবা পারকিনসনস রোগ থেকে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে মিউজিকের ভূমিকা অনন্য। কারণ মিউজিক মস্তিষ্কের পেশি স্বাভাবিক রাখে। নিয়মিত ২৫ মিনিট গান শুনলে ব্যাক পেইন অন্যত্র পাড়ি জমায়। পাওয়া যায় প্রশান্তির ঘুম। গর্ভবতী মায়েরা নিয়মিত গান শুনলে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ সুন্দর হয়। গবেষকদের দাবি গান শোনার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ বাড়ে। মনোযোগ এবং দক্ষতাও বাড়ে।

মিউজিক থেরাপির গুরুত্ব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রচুর সংগীত শিল্পী আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে সেখানে ভর্তি হওয়া আহত রোগীদের সংগীত পরিবেশন করে শোনাতেন। এর ফলে রোগীদের স্বাস্থ্যে বেশ উন্নতি দেখা যায় এবং ডাক্তাররা সংগীতশিল্পীদের হাসপাতালে স্থায়ী সদস্য হিসাবে রাখতে শুরু করেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও সংগীতশিল্পীরা শরণার্থীশিবির থেকে শরণার্থীশিবিরে ছুটে বেরিয়েছেন, গান গেয়ে লড়াই-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন মানুষকে। যোদ্ধাদের করেছেন উদ্দীপ্ত। কাজেই প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা যায়, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সংগীতের প্রভাব অনন্য।

**শরীরকে চলমান ও মনকে সুন্দর রাখতে প্রয়োজনে
মিউজিক থেরাপি গ্রহণ করি।**

*সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

আমরা মানুষ। মানবিকতা আমাদের ধর্ম। মানবতা বিকাশে কবি-সাহিত্যিকগণ যুগে যুগে অপরিমেয় অবদান রেখে চলেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব লেখনী দ্বারা আজীবন মানবতার জয়গান গেয়েছেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মন-মানসিকতা গঠনের, চেতনার উন্মেষের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। অন্যদিকে সামাজিক অনাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি কণ্ঠ আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ্বকবি ও জাতীয় কবির চিন্তা-চেতনা, অন্তর্নিহিত ভাব ও দর্শন আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এই প্রত্যাশায় সাপার বিশেষ সংখ্যার আয়োজন।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. ফিরোজা বেগম
লেলিন আজাদ
সামসুন্নাহার মনি

লেখা আহ্বান

সমাজের নানা অসঙ্গতি-বৈষম্য কি আপনাকে ভাবিয়ে তোলে? আপনি কি সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে বন্ধপরিকর? আপনি কি আপনার লেখনি দ্বারা সচেতন জনসমাজ গড়ে তুলতে চান? তাহলে আপনি যেই হোন, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সচেতনতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা সচেতন বার্তায় লেখা পাঠাতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সাপার গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠান বা ঘরে বসেই নিয়মিত ত্রৈমাসিক সচেতন বার্তা পড়তে চান? তাহলে বাৎসরিক দুইশত টাকা প্রদান সাপেক্ষে আজই গ্রাহক হোন। আমরা গ্রাহকদের নিয়মিত কুরিয়ার বা ডাকযোগে সচেতন বার্তা প্রেরণ করে থাকি। বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সোশ্যাল এওয়ারন্যাস প্রোগ্রাম ফর অল (সাপা)

মধ্যরচর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে ফজিলাতুন নেসা কর্তৃক প্রকাশিত
মোবাইল : ০১৭১৬০৫৬১৯২
ই-মেইল : apamskd@gmail.com
মূল্য : ২৫ টাকা